Issue cover not available

Vol. 17 | No. 1 | 1973

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল কাব্য পাঠের ভূমিকা

Volume	17
Issue	1
Year	1973
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	June 1, 1973
DOI	10.62328/sp.v17i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i1.5
Pages	129-144
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুল কাব্য পাঠের ভূমিকা

রফিকুল ইসলাম

বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কবিতা রবীন্দ্র কাব্যের প্রভাবে পরিচিহ্নিত। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের কাব্য ধারাকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিমণ্ডল থেকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠা করা দুষ্কর। সচেতন বা অচেতনভাবে তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুসারী। সে অনুসরণে তাঁদের আনন্দই ছিল, কারণ কাব্যের পরিচিত পথে চলা তারা সহজতর ভেবেছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রযুগেও অন্ততঃ তিন জন কবি ছিলেন যাঁদের আলাদা করে চিনতে অসুবিধা হয় না। তাঁরা হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম। এ দু'ধারার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত; তিনি ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী ও নতুন ধারার সাধকদের মধ্যে যোগসূত্র।

সত্যেন দত্তকে কোনো সমালোচক 'রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, এবং নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি ক্ষুদ্রতর, কিন্তু নতুন' বলে উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য, কারণ সেই প্রখর রবীন্দ্র যুগেও সত্যেন দত্তের আলাদা চেহারা চেনা যায়। সত্যেন দত্ত রবি-ভক্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রচনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবজাত সাধনা, যা রবীন্দ্রধারা থেকে অংশতঃ স্বতন্ত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যেন দত্তের প্রভাবও সমকালীন বহু বিশিষ্ট কবির ওপর পড়েছে।

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা ও অনুবাদসহ সমগ্রকাব্য প্রবাহের আলোচনা থেকে তাঁর বিশেষত্বের যে প্রধান লক্ষণগুলো নির্দেশ

১৭—

করেছেন তা সংক্ষেপে হল, খাঁটি বাংলা ভাষা ও ছন্দের প্রতি আগ্রহ, তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের সঙ্গে তৎসম ও বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার, তানপ্রধান, ধ্বনি-প্রধান এবং বিশেষভাবে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের নৈপুণ্য, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ চিন্তা, গীতি কবিতার প্রকারগত বৈচিত্র্যের ও রূপগত কৌশলের প্রকাশ, মিলের যথার্থতা, শব্দের অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের বিচিত্রতা, প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যাদর্শের প্রতি অনুরাগ, অনুবাদকের অক্লান্ত অধ্যবসায়, সাহিত্য পর্যালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি, বৈয়াকরণের শব্দজ্ঞান, ছান্দসিকের সৌষমচিন্তা।

যুদ্ধোত্তর যুগের দ্বন্দ্ব চঞ্চল মানসিকতা এবং সংশয় দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়েও সত্যেন দত্তে গভীর কাল ও সমাজ চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'সাম্যসাম,' 'শূদ্র,' 'মেথর,' 'জাতির পাঁতি' প্রভৃতি কবিতায় এবং সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনমূলক কবিতাগুলোর মাধ্যমে তিনি 'রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ন এবং অন্তর্গত' হয়েও বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত করতে কম সহায়তা করেননি। সে জন্যেই শুধুমাত্র সমকালীন কবিদের ওপরেই নয়, পরবর্তী কালের অতি আধুনিক কবিদের অগ্রগামী জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল। দীপ্তি ত্রিপাঠী অতি আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশে সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন ইতিহাসচেতনা ও দেশজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার সচেতন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে প্রথম লক্ষ্য করা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাছে অস্পষ্ট এবং রহস্যময় বোধ হত। "সোনারতরী" কবিতাটির উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন,

> পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবিতা বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় তো বলিতে হইবে যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ। কারণ এই কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে, একেবারে অর্থশূন্য স্ববিরোধী।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রোহ যতটা শ্লেষাত্মক ও কোলাহলময়, কাব্য ক্ষেত্রে ততটা গভীর নয়; তাই সমকালীন ও পরবর্তীকালের তরুণ কবিদের মধ্যে কারো কারো ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়লেও (কবি আবদুল কাদির নজরুলের 'শাতিল্ আরব' কবিতার ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "মেবার পাহাড়" গানটির অনুরণনের কথা উল্লেখ করেছেন) কাব্যের বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কোন পরিবর্তন আনায়ন করতে সমর্থ হননি যা পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর "সনেট পঞ্চাশৎ" প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন,

> সনেট লেখবার অন্য কারণও ছিল; রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম। তার প্রমাণ আমার একটি অপ্রকাশিত কবিতায় আছে।

প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ'এ 'উপদেশ' সনেটটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে বাংলা কবিতার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,

> প্রিয় কবি হতে চাও লেখো ভালবাসা
> যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
> তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,
> জোর করা ভাব আর ধার করা ভাষা।

উনিশ শতকের অপেক্ষাকৃত শান্ত, ঋজু, বলিষ্ঠ সমুন্নত জীবনের প্রতিভূ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্যের মূল ধারা আবর্তিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই নতুন যুগের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন। গদ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী", "অপরাজিতা", "আরণ্যক" প্রভৃতি উপন্যাস ও "মৌরীফুল" গল্প, তারাশঙ্করের "চৈতালী ঘূর্ণী", "কালিন্দী", "ধাত্রী দেবতা", প্রভৃতি উপন্যাস ও "বেদেনী" ইত্যাদি গল্প; মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস "পদ্মা নদীর মাঝি" ও গল্প "প্রাগৈতিহাসিক", শৈলজানন্দের গল্প "কয়লা কুঠি", "অতসী"; প্রেমেন্দ্রমিত্রের "পুতুল ও প্রতিমা"

প্রভৃতি সৃষ্টি আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ''গোরা'' ও ''ঘরে-বাইরে'' বা ছোট গল্পগুলো থেকে ভিন্নতর। কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল এবং নজরুল ইসলামের রচনায়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদী কবি আখ্যা লাভ করেছিলেন। তাঁর চাকুরী গত পেশা ছিল ইনজিনিয়ারিং। তাঁর কাব্য গ্রন্থসমূহের নামকরণ লক্ষ্য করলেই তাঁর দুঃখবাদী খেতাবের যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায়। ''মরীচিকা'', ''মরুশিখা'' ও ''মরুমায়া''—তাঁর এই প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থের নামপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'অনুপূর্বা'র ভূমিকায় লিখেছিলেন,

> পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি চিরশ্যামল বাংলা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানী করে একটা কৌতুহল জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস করেছিলাম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়,

> আধুনিক বাংলা কাব্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাতেই প্রথম দেখা দিয়েছে মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে স্পষ্টোচ্চারিত অভিযান, নিমীলিত নেত্রে সৌন্দর্যরতির উদ্দেশে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আঘাত এবং গণ-সংযোগের প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের যুগে তিনি পথিকৃৎ কবি!

যতীন্দ্রনাথ অতিশয় আত্মচেতন কবি ছিলেন, আর সেই আত্মসচেনতা ছিল প্রচলিত কাব্যরীতির বিরুদ্ধে,

> কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস
> বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।
> সেই উপবন, মলয়পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
> প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি!

যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''মরীচিকা'' যে বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল, ''কল্লোল'' পত্রিকাটিও সেই ১৩৩০ সালেই প্রকাশিত হয়। ''মরীচিকা'' কাব্য-গ্রন্থের ''ঘুমের ঘোরে'' কবিতাটি ''কল্লোল'' গোষ্ঠির কাছে খুবই আদৃত হয়েছিল।

> কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো! তুমি দেখি সব ওচাঁ,
> কিরণ ঝাঁটার হিরক কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।
> জানি তুমি ভালো ছেলে,

ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিক হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায় কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারায় বুকে?

রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যবর্তী সময়ে মোহিতলালের আবির্ভাব। অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে মোহিতলালের কাব্যে মননশীলতার স্পর্শ ছিল। এই মননশীলতা এবং তাঁর নির্ভীক দেহবাদ—"ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা"—কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করেছিল। পরিশীলিত, মননশীল বুদ্ধির দীপ্তিতে ও বিদেশী সাহিত্যরসে স্নাত আধুনিক কবিদের কাছে মোহিতলালের আবেদন কত ব্যাপক ছিল, বুদ্ধদেব বসুর নিম্নোক্ত উক্তি তার পরিচয় বহন করছে,

> আমাদের তরুণ বয়সে, যখন রবিদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপটি আমরা পার হচ্ছিলাম, তখন যে দুজন কবিতে আমরা তখনকার মতো গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাঁদের একজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আর একজন 'বিস্মরণী'র মোহিতলাল…। আমরা কল্লোলের অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনছি 'বিস্মরণী'র বড়ো বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবী করলেন প্রায় উল্টো রকম সুর শুনিয়ে সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো থেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্রমাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব করে গোরুর গাড়ী চালিয়ে নেবার সুর।

কিন্তু মোহিতলাল এবং কল্লোল গোষ্ঠির মধ্যে সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে মোহিতলাল "সত্য সুন্দর দাস" ছদ্মনামে কল্লোল গোষ্ঠির বিরুদ্ধে লেখনি চালনা করেন।

মোহিতলাল বাংলা কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং অতীন্দ্রিয় শুচিবাদের মধ্যে আবেগের উত্তাপ আনয়ন করেন, কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল অন্যক্ষেত্রে। তাঁর উগ্র ব্যক্তিসচেতনতা কবিতাকে আভিজাত্যের ক্ষুদ্র সীমায় সীমায়িত করে রেখেছিল। তাই যে বিক্ষুব্ধ যুগ যতীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে সৃষ্টি করেছিল, যুগের যে বিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও পরবর্তীকালে প্রভাবান্বিত করেছিল,

মোহিতলালে তার কোন আভাস আমরা খুঁজে পাই না। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সত্যেন দত্ত পর্যন্ত প্রত্যেকের রচনায় অল্প বিস্তর ছায়াপাত করেছে, কিন্তু বাইরের সামাজিক বা রাজনৈতিক কোলাহল মোহিতলালকে স্পর্শ করেনি। অন্যদিকে তাঁর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ভাস্কর্যধর্মী আঙ্গিকের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সাধারণ পাঠক সমাজও তাঁর কাব্য রস আস্বাদনে সমর্থ ছিলেন না।

যুগ সন্ধিক্ষণের বিক্ষোভের কাছে আসার পথে মোহিতলালের পক্ষে প্রধান বাধা ছিল বৈদগ্ধ আর যতীন্দ্রনাথের পক্ষে নির্লিপ্ততা। এই বাধা নজরুলের ছিল না। তা ছাড়া নজরুলের আবির্ভাবের ক্ষেত্র কিছুটা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; সত্যেন দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনামূলক কবিতায় সমাজের অনাচারের প্রতি শ্লেষ ও নিপীড়িতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের মাধ্যমে। প্রথম মহাযুদ্ধ প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণার পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, বাংলা কাব্যেও রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূত্রপাত হয়েছিল, সুতরাং নজরুলের আবির্ভাব বাংলা কাব্যের জন্য বিস্ময়কর হলেও অভাবিত নয়। নজরুলের আবির্ভাবের চিত্র বুদ্ধদেব বসু সুন্দর করে অঙ্কিত করেছেন,

> কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিল যে, তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু'তিন দশক কেটে গেল বাংলাদেশের। এই মাঝখানের সময়টাই সত্যেন গোষ্ঠির সময়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটা তাঁরা সামলে নিলেন—অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন...যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙ্‌লো। ...নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, ভিন্ন একটা ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন···যেহেতু তাঁর পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না করে উল্টো আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তি-গুলোকে, সেই জন্য কোনরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েও শুধু আপন ভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পালাতে পারলেন, তিনি বাংলা কবিতায় জন্য নতুন রক্ত আনতে পারলেন।...যে আকাংখা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানাদিকে, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘন্টা বাজলো।

প্রথম মহাযুদ্ধে নজরুলের ভূমিকা এদেশের যে কোনো কবির চেয়ে সক্রিয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ভাবজগতে যে সুদুর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে, সে সম্পর্কে নজরুল মানস কতটা সচেতন ছিল বলা শক্ত। মহাযুদ্ধের ফলে রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিক্রিয়া এবং ইংরেজী কাব্যে যে বিপ্লব দেখা যায়, তা নজরুলের এসেছে অন্যভাবে। বস্তুত নজরুলের সৈনিক জীবনের পর থেকেই নজরুলের প্রকৃত কবি জীবনের আরম্ভ। নজরুল যে যুগের চারণ কবি আখ্যা লাভ করেছিলেন, সে যুগের বিক্ষোভ, সংঘাত, দ্বন্দ্ব কোলাহল প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। নজরুল এ যুগের সৃষ্টি, এবং যুগের প্রয়োজন তিনি মিটিয়েছেন।

নজরুলও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, কল্লোল গোষ্ঠী তখন বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিল। কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে নজরুলের মৌলিক পার্থক্য ছিল। 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ ছিল ভাবগত, এবং সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ ; অন্যদিকে নজরুলের বিদ্রোহ বস্তুগত সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপ্ত। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে মোহিতলাল ও নজরুলের ভাবগত ঐক্য ও পার্থক্যের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সামগ্রিকভাবে সত্যেন দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠী, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যকে পুরাতন প্রভাব থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করেছেন। আর নজরুলের কবিতা এ সাধনার পরিণতি।

দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক কবিতার তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন,

১। কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী

২। ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী

৩। সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতর সুরের সাধক।

দীপ্তি ত্রিপাঠী ভাবের দিক থেকে থেকে আধুনিক কবিতার সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন নিম্নরূপ—

রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্মে সংশয় এবং তৎসঞ্জাত

অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ভগবান ও প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত। বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ। আত্মা বিরোধী ও অনিকেত মনোভাব, মননধর্মিতা, অনেক সময় জ্ঞানের ভারে দুরূহতার সৃষ্টি। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সচেতন গ্রহণ। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব, অচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসংবদ্ধতা। আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রভাব। মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষতঃ সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নূতন সমাজ সৃষ্টির আশা।

এই সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি লক্ষণের ভিত্তিমূল নজরুলের কবিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সাধনার বড় সার্থকতা এই যে, রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে বিদ্রোহী না হয়েও স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে তাঁর মুক্তি। ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতায় যে বিবিধ পরিবর্তন দেখা দিল, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলো অবশ্য নজরুলের সুস্পষ্ট নয়। তবে প্রবাদ, চলতিশব্দ গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে, ভাষা সম্বন্ধে শুচিবায় পরিহারে, নূতন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, বিষয়বৈচিত্র্যে ও ছন্দ পারিপাট্যে নজরুল তাঁর পরবর্তী আধুনিক কবিদের পূর্বসূরী। জীবনানন্দ রচিত নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলোতে নজরুলের কণ্ঠ চিনতে অসুবিধা হয় না—

আমরা অশ্বারোহী
যাযাবর যুবা, বন্দিনীদের ব্যথা মোরা বুকে বহি।
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি :
মোদের প্রাণের পূজার দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি।

(—নব নবীনের লাগি)

আধুনিক কবিতায় রোমান্টিক বিরোধী নিউ ক্লাসিজমের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুর রূপ মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস পূর্বে ছিল; চোখ দিয়ে বস্তুর সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা আধুনিক কবিতায়। নজরুল প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার

মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছেন। ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তাঁর পটভূমি বিস্তৃত। হিন্দু মুসলমান, ও ইরাণীর ঐতিহ্য তাঁর মানসকে অভিষিক্ত করেছে, অথচ তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মতো আধ্যাত্মিক সমর্পন নেই, অর্থাৎ সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে উত্তরণের বা দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে যাবার প্রয়াস তাঁর মধ্যে নেই। নজরুলের প্রবল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছে, তাই মহত্তর জীবন চেতনা বা আধ্যাত্মিক সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে জাগরণ দেখা গেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষুদ্র প্রেম বা সৌন্দর্য মহৎপ্রেম বা বৃহত্তর সৌন্দর্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়নি। রূপকল্পে বাস্তব ঘটনার চেতনা বা উপস্থিতি নজরুলের প্রখর। কুলি, মজুর, শ্রমিক, জেলে, বারাঙ্গনা, ঝড়, তুফান, সমাধি, শ্মশান, বিদ্রোহ, বিপ্লব, জন্ম, মৃত্যু, সবকিছু তার রূপকল্পে ভীড় জমিয়েছে। প্রকৃতি নজরুলের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃতিকে তিনি নিজের মনের চেহারায় প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রকৃতিতে কোন সত্তা আরোপ করেননি। বাংলা সাহিত্যে 'স্কাইলার্ক" বা "নাইটিঙ্গল"কে অসীম আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মহত্তর সত্তার প্রতি ধাবমান হবার প্রয়াস নজরুলে নেই।

সাম্যবাদী চেতনা ও সমাজ সচেতনতা নজরুলের অন্যতম প্রধান সুর এবং বাংলা কাব্যে তা বলিষ্ঠ সংযোজন।

উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি লক্ষণ আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস। তবে যতখানি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী হলে, যতখানি বুদ্ধিপ্রধান হলে তিনি আধুনিক কবি হতে পারতেন, নজরুলের তা নেই। নিউ ক্লাসিক গুণ আয়ত্ত করতে তিনি সক্ষম হননি, নানা স্থানে তাঁর মধ্যে পুরোনো কবির স্বভাব প্রবল। আরও একটা কথা এই যে মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সাম্যবাদী ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও ধর্মকে তিনি কখনো নাকচ করেননি। স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ গভীর বিশ্বাসের নামান্তর মাত্র। মানুষ, ঘটনা ও বস্তুকে তিনি ধর্ম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন, তাই ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিমিশ্র। সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন বিশ্বাসের প্রতি তিনি একাগ্র নন। মানুষের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি, মানুষের যে জয়গান তিনি

করছেন, চণ্ডীদাসের সুরও তাই—"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" মানবতার এই জয়গান রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে। সত্যেন দত্ত বরং রূপ এবং ছন্দধ্বনির বিচারে অধিকতর পরিমাণে ক্লাসিক-ঘেঁষা ছিলেন। এ সব দিকদিয়ে বিচার করলে এক অর্থে বলা চলে যে, আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম লগ্নের কবি নজরুল ইসলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং আধুনিক কবি নন।

নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনার সার্থকতা রবীন্দ্র সাহিত্যে সচেতন বিদ্রোহী না হয়েও রবীন্দ্র কাব্য পরিমণ্ডলের বাইরে স্বচ্ছন্দ বিহার। সচেতন প্রয়াস সর্বদা সার্থকতার আনন্দে উদ্ভাসিত নয় বাংলা কবিতায়। যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিমিত, সে ঐতিহ্যের সঙ্গে অপরিচয় হচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক, অপরিচয়ের ঐ প্রতিবন্ধকতা নজরুল ইসলামে নেই, অথবা কেবলমাত্র সে ঐতিহ্যের ছত্রচ্ছায়ায়, কাব্য রচনার বিড়ম্বনা ও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত।

যৌবন ধর্মের বিশিষ্ট গুণ যদি দু'টি বস্তু বিদ্রোহ আর প্রেম, নজরুলে তার অনাবিল প্রাচুর্য। নজরুল-সমালোচকের কাছে এ দুটির সমান্তরাল উপস্থিতি অতি সহজ আবিষ্কার, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞায় অনুপস্থিত একটি সীমারেখা, যা প্রেম আর বিদ্রোহের মধ্যে নয়, কবিত্বের লক্ষণে প্রাচীনতা আর নবীনতার মধ্যে। তৃতীয় দশকে নজরুলের শক্তি ও সাহস সর্বজয়ী প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিকে অজান্তে নাড়া দিয়েছিল, নবীন কবিরা নিজেকে চেনবার ও চেনাবার সুযোগ পেল তার ফলে, কিন্তু নজরুলের কবিতা নবীনতার পুরো গৌরব পেল না। নজরুলে যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মুক্তি, (ভাব, ধর্ম ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যতটা, শৈলী বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ততটা নয়) তা উদ্দীপনামূলক কবিতা পরিধির বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাইরে যেতে যেন দ্বিধান্বিত। প্রেমের কবিতায় এ নবীন কবি যে সনাতন (ভাব ধর্মের দিক থেকেও) সে সত্য তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তুলনামূলকভাবে আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহার প্রেমের কবিতায় কম, সর্বোপরি প্রেমিক কবি নজরুল বিদ্রোহী নজরুলের মত সমাজ

সচেতন নন, বরং বিশেষ নারীর কাছে আত্মসমর্পণের গৌরবে আনন্দিত,

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে
বিজয়িনী। নীলাম্বরীর আঁচল
তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।
(বিজয়িনী)

সাম্যবাদী নজরুল কখনো মিছিলের মধ্যে তার প্রিয়াকে বিজয়িনী রূপে দেখবেন না, অতি আধুনিক সাম্যবাদীর প্রেয়সীর আদল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত ;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান।
ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।

নজরুল প্রেয়সীর সান্নিধ্যে এলে 'বিদ্রোহী কবি' যেন বিশ্রাম গ্রহণ করেন,

হে মোর রাণী! তোমার কাছে
হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার
চরণ তলে এসে।

প্রেমের যে রোমান্টিক বিষন্নতা বাংলা কাব্যে শুরু বিহারীলাল থেকে, চরম উৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথে, পরবর্তীকালে গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিতলাল মজুমদারে যার সংগে যুক্ত হল দেহজ আবেগের উত্তাপ, নজরুলের প্রেম কাব্য তাদের স্বগোত্র। কিন্তু পার্থক্য আছে নজরুলে কিছু। তিনি বিহারীলালের মতো মিস্টিক নন, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমে অধ্যাত্মবাদী নন বা পরবর্তীকালের মোহিতলালের মতো নৈতিকশাসনে পীড়িত নন, বরং কল্লোল কালিকলম গোষ্ঠীর মতো দেহগত

প্রেমের সঙ্গে কামনা বাসনার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকৃতির বলিষ্ঠতায় নির্ভীক। নজরুলের উদ্দীপনামূলক কবিতায় ঐতিহ্যের যে বিস্তৃত পটভূমি আমাদের বিস্মিত করে, প্রেমের ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ (হাফিজের প্রভাব সত্ত্বেও)। প্রেমিক নজরুল ভাবাবেগপ্রবণ বাঙালী কবি। নজরুল বাস্তববাদী কবি, রূপকল্পে বাস্তব ঘটনার চেতনা বা উপস্থিতি নজরুলে প্রখর। নজরুলে ভাবাবেগপ্রবণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছে, তাই মহত্তর জীবন চেতনা বা আধ্যাত্মিক সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তার মধ্যে জাগরণ দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুল ক্ষুদ্র প্রেম বা সৌন্দর্য, মহৎ প্রেম বা বৃহত্তর সৌন্দর্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়নি। বৈষ্ণব কবি দেহাতীত থেকে দেহে প্রত্যাবর্তনের আকুতি থেকে রেহাই পাননি,

> রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
> প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ।।

আর রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শুরু করেন দেহ থেকে,

> ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
> এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
> গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
> তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।
> প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
> অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।

প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দেহ মিলনও কামনা

> প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
> প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

কিন্তু দৈহিক আবেগের এ জাগরণ রবীন্দ্রকাব্যে ক্ষণস্থায়ী; পরমুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠেছেন তিনি।

> ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
> ম্লান করিও না আর মিলন পরশে।

রবীন্দ্র কাব্যে বাকীটুকু সর্বদাই তাই সীমার মাঝে অসীমের খেলা,

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে কাঁপিছে তেমনি আত্মার রহস্য শিখা।

নজরুল ইসলামে প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক দুটি সত্তারই উপস্থিতি রয়েছে, প্রথমটি বিশেষভাবে প্রবল, দ্বিতীয়টি ক্ষীণ। তাঁর 'অনামিকা" ও "পুজারিণী" কবিতায় এ দুটো সত্তারই উপস্থিতি। নজরুল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অমানবিক, রহস্যময়ী মানস সুন্দরী বা জীবন দেবীর উদ্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রী নন, কিন্তু কোন আদর্শ প্রিয়াকে, অনামিকাকে কামনার সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পেতে ক্রন্দনরত, চিরবিরহী। এ যেন বৈষ্ণব কবির অরূপকে রূপে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস। কামনা বাসনার সীমিত জীবনে প্রাত্যহিকতার কোলাহলে কবির সঙ্গে তাঁর প্রেয়সীর যে লীলা সম্পর্ক, নজরুলের প্রেম কাব্যে তারও প্রকাশ।

নজরুল কখনো অতি আধুনিক কবির "প্রেমে পতন ছাড়া কিছুই নেই" সতর্কবাণীতে ভীত নন, কারণ সে পতনেই তাঁর আনন্দ। তদুপরি, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রেমের কবিতায় নজরুল সনাতন বাঙালী কবি। সে কারণেই উদ্দীপনামূলক কবিতায় নজরুল যতখানি নবীন, প্রেমের কবিতায় ততখানি নন। যদিও এ সনাতন প্রেমের কবি রক্ষণশীল নন, কারণ নজরুলের আর্টের উপরে মরালিটীর দাবী স্বীকৃত নয়। মরালিটির প্রশ্নে তিনি আধুনিক প্রতীকী কবিদের সমধর্মী, অবশ্য সে ধর্ম সীমাবদ্ধ কেবল ভাবধর্মে। প্রতীকী কবিদের ভাষাব্যবহারের নির্বাহুল্য, শব্দ চয়নের নিখুঁত ভাস্কর্য ও বাক্য নির্মাণের ঘন রূপ প্রজ্ঞার পরিপক্কতা, সচেতন মনন নজরুলে কেউ আশা করে না। এলিয়টের পক্ষে আস্ত একখানি উপন্যাসকে 'পোর্ট্রেট অফ্ এ লেডির' মত ছোট কবিতায় পরিবেশন সহজ, স্বাভাবিক, নজরুলে হৃদয়াবেগের সামান্যতম ভাব প্রকাশে দীর্ঘ পুনরুক্তির একান্ত প্রয়োজন (ব্যতিক্রম, নজরুলের গান)।

এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রেমিক নজরুলের সব কথা কোন দিন কবিতার ভাষায় বলা হবে না।

তুমি যে তুমিই, ওগো সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।

নজরুল যে কোন দিন সনেট রচনায় হাত দিলেন না, সেটাই কি স্বাভাবিক নয়, দুর্বার আবেগকে গাঢ় সংবদ্ধ রূপ দেবার প্রতিভা তাঁর মধ্যে আমরা আশ্য করি না।

"কড়ি ও কোমল" এর রবীন্দ্রনাথ, "প্রেম ও ফুল" এর গোবিন্দচন্দ্র দাস, "স্বপন পসারীর" মোহিতলালের সঙ্গে নরুলের মিল প্রেমের কবিতায়, কখনো বিহারীলালের কথাও মনে পড়ে। প্রতীকী কবিদের মধ্যে যে বুদ্ধদের বসু উনিশ শতকের খেয়ালী সুরকে বিংশ শতাব্দীতেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, নজরুলের প্রেমের কবিতার আলোচনায়, তাঁর উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিত হবে না। পুজারিণী কবিতায় প্রেয়সীর তাপসী মূর্তি, শুদ্ধতার প্রলেপ, আদর্শ নারী, প্রেমিকের দেহগত সমস্ত প্রেম সম্পর্কের পার্শে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, 'মাধবী প্রলাপ' এর মধ্যে তার অবসান ঘটে।

আজ লালসা অলস মদে বিবসা রতি
শুয়ে অপরাজিতার ধনী স্মরিছে পতি
তার নিধুবন উন্মন
ঠোটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কাম কন্টক মহুয়া কুঁড়ি।

নজরুলের এসব কবিতায় যে দেহবাদের প্রশ্রয় রয়েছে তা গোবিন্দ দাসের কবিতার নিম্নোক্ত অংশটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমিও নারীর রূপে,
আমিও কমনীয় কেলি কালীদহ
ও কর্দমে অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।

ইংরেজী সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের অধিকার ছিল না, ইংরেজী সাহিত্য রস সিক্ত মোহিতলালের দেহজ প্রেমের আবেগ স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের মতই উদ্দীপ্ত।

হায় দেহ ! নাই তুমি ছাড়া কেহ
জানি তাহা প্রণে প্রাণে
মুরতি পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমা পানে।
তোমার সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কালদেশ।

(কৌতুকের বিষয়, দেহবাদী মোহিতলাল, নজরুলের "মাধবী প্রলাপ" কবিতায় মরালিটীর হত্যা দেখে শিউরে উঠেছিলেন !)

আলোচ্য কবিদের কেউ অবশ্য বুদ্ধদেব বসুর মতো আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবেন না।

নতুন ননীর মতো তনু তব।
জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী।)

প্রকৃতি প্রেমের কবিতায় বাংলা কাব্যে সনাতন কবিদের যে উচ্ছ্বাস, সে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন পাই নজরুলে। নজরুল বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন কম, প্রকৃতিতে তিনি কোন সত্তা আরোপ করেননি, প্রকৃতি তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে কবির মনের চেহারায়। স্কাইলার্ক বা নাইটিঙ্গলকে অসীম আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মহত্তর সত্তার প্রতি ধাবমান হবার প্রয়াস নজরুলে নেই, পরম সুন্দরের প্রতিফলনও প্রকৃতির মধ্যে দৃশ্যাগত নয় নজরুলে। প্রকৃতি নজরুলের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গী জড়িত। 'চক্রবাক' কাব্যের ভূমিকায় বলা হয়েছে, কবি নিজের প্রিয়াকে দেখেছেন প্রকৃতির

ভিতরে। প্রকৃতি আর প্রিয়া একাকার হয়ে যায়। কবির হৃদয় চক্র-চক্রবাকীর জন্যে প্রকৃতির মধ্যে বিচরণশীল।

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি
এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর
বিস্মরণীর পারে
খুঁজিতে তখন এই কিনারায়
আসিবে তখন তুমি
খুঁজিবে সাগর মরুপ্রান্তর
গিরি দরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়,
ঝরা পালকের স্মৃতি
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে
আমার বিরহ গীতি।

নজরুলের এই ঝরা পালকের স্মৃতি বাংলা কাব্যের চিরন্তন রোমান্টিক বিষন্নতার প্রতীক। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে' পেয়েছি।

মাঝেতে উথলে নদী দুপারে দুজন
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজন।

নজরুলেও একই কান্নার সুর আমরা শুনতে পাই,

এ পার ও পারে মোরা, নাই নাই কুল
তুমি দাও আঁখিজল আমি দিই ফুল।